

শরৎ উৎসব

শিউলি তলায় ভোরবেলায়

কুসুম কুড়ায় পল্লিবালা

কাজী নজরুল ইসলাম

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে আমরা কি কখনো দেখেছি, উঠোনের ঘাসগুলো এবং ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু পানির ফোঁটা? মনে হয় হালকা বৃষ্টি হয়ে গেলো এই কিছুক্ষণ আগেই। আসলে এগুলো বৃষ্টি ফোঁটা নয়, শিশির। এর মানে হল বর্ষাকাল শেষ হয়ে শরৎ শুরু হয়ে গেছে। একটু রোদের আলো পড়তেই শিশিরগুলোকে মনে হয় মুক্তদানা। যেন মুক্তোর মালা ছিঁড়ে পুরো উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের যাদের বাড়িতে, আশেপাশে অথবা বিদ্যালয়ে শিউলি গাছ আছে তারা তো জানি এই সময়টাতেই শিউলি ফুল ফোটে। ঝরেপড়া সাদা কমলা রঙ শিউলি ফুলগুলো গাছের তলায় তৈরি করেছে বিভিন্ন নকশা যা দেখতে অনেকটা আল্লনার মত। সেই শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠে চারপাশ। আমরা অনেকেই শিউলি ফুল কুড়িয়ে মালা ও বিভিন্ন গয়না বানাই, নিজে পরি, অন্যদেরও উপহার দেই। চলার পথে আরেকটা বিষয় কি খেয়াল করেছি? হয়তো বেশ ঝলমলে রোদের মাঝে হাঁটছি আমরা কিন্তু কোথা থেকে একখণ্ড মেঘ উড়ে এসে হঠাৎ করেই এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে গেলো। এই রোদ, এই বৃষ্টি এটাও শরতের লক্ষণ। শরৎকালেই এমনটা হতে দেখা যায়।

এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে
সকাল বেলায় ঘাসের আগায়, শিশিরের রেখা ধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎ প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ও কোমলতার প্রকাশ ঘটেছে বাঙালি লেখক-কবিদের বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, গান, নাটক, কবিতা, ছড়ায়। ধীরে ধীরে শরৎ একটা বিশেষ আয়োজন উপলক্ষ্য হয়ে উঠে আমাদের কাছে। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমরা শরৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি।

বাংলার প্রথম শরৎ অনুষ্ঠান উদযাপন হয় পুরান ঢাকায় ওয়ারীর বঙ্কা গার্ডেনে। এখন এটি নিয়মিতভাবেই আয়োজন করা হয় চারুকলা অনুষদের বকুলতলা সহ বিভিন্নস্থানে।

কবিগুরু শরৎ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ছোটদের উপযোগী একটি চমৎকার নাটক রচনা করেছেন।
আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের এবারের শরৎ অনুষ্ঠানে এই নাটকটির একটি অংশ বেছে নিতে পারি —

শারদোৎসব



দ্বিতীয় দৃশ্য
বেতসিনীর তীর। বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান
বাউলের সুর

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে।
সাদা মেঘের ভেলা!

একজন বালক — ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে।
দ্বিতীয় বালক — না ঠাকুরদা সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।
ঠাকুরদাদা — না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে-সব হয়ে-বয়ে গেছে।
আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর।-

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা!

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুরদা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন? তোমার সঙ্গে আড়ি! জন্মের
মতো আড়ি!

ঠাকুরদাদা। এতবড় দণ্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা
আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর।-

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙ্গে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো, ঐ দেখো, সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেনা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না। (সংক্ষেপিত)

যা করব—

- প্রথমে আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাব।
- একটি দল নাটকের চরিত্রগুলোতে অভিনয় করব। কেউ কেউ ছেলের দল হব, একজন হব ঠাকুরদা। আমরা সংলাপের মাধ্যমে এই নাটকটি উপস্থাপন করব।
- একটি জায়গাকে মঞ্চের জন্য নির্ধারন করে একদল ছবি ঐকে মঞ্চ সাজাব। সাথে হাতের কাছে শরতের যা কিছু প্রাকৃতিক উপকরণ পাওয়া যায় তা দিয়ে মঞ্চ সাজানোর কাজ করব।
- এক দলের কয়েকজন ধানখেত হতে পারি, কয়েকজন মেঘ হয়ে ভেসে যেতে পারি, কয়েকজন পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারি, কয়েকজন নৌকা বেয়ে চলার ভঙ্গি করতে পারি।
- একটি দল নাটকের থাকা গানটি গেয়ে সহযোগিতা করব।
- আরেকটি দল গানের কথা বুঝে সে অনুযায়ী নিজেরাই দেহ ভঙ্গি তৈরি করে পুরো গানটিকে উপস্থাপন করব, এতে আমরা একটি সৃজনশীল নৃত্য পরিবেশনা উপভোগ করতে পারব।

‘কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি’ পাঠে আমরা দাদরা তালের বোল সম্পর্কে জেনেছিলাম এই পাঠে আমরা দাদরা তালের সাথে নিচের সারগামটি মাত্রার সাথে অনুশীলন করব।

+	o				
১	২	৩	৪	৫	৬
সা	রে	গা	।	রে	গা
গা	মা	পা	।	মা	পা
পা	ধা	নি	।	ধা	নি
সাঁ	নি	ধা	।	নি	ধা
ধা	পা	মা	।	পা	মা
মা	গা	রে	।	গা	রে
					সা

সৃজনশীল ভঙ্গি

আমরা সাধারণত প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে থাকা বিভিন্ন উপাদান থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভঙ্গি দেখি এবং শিখি। যেমনঃ নদী থেকে আমরা ঢেউয়ের ভঙ্গি দেখলাম এবং শিখলাম। এই ঢেউভঙ্গি আমরা কেউ হাত দিয়ে তৈরি করি, কেউ পা দিয়ে, কেউ কোমর দিয়ে, কেউ কাঁধ দিয়ে। এই যে একেকজন একেক ভাবে নদীর ঢেউটাকে ফুটিয়ে তুলছি এটাই সৃজনশীল ভঙ্গি।

এইভাবে গানের কথার অর্থ অনুযায়ী ভঙ্গি তৈরি করার যে প্রচলন অর্থাৎ সৃজনশীল ধারা সেটির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন যিনি তাঁকে কি আমরা জানি? তিনি হলেন বাংলাদেশের গুণী নৃত্যপরিচালক,



বুলবুল চৌধুরী

বুলবুল চৌধুরী ছিলেন আধুনিক নৃত্যের পথিকৃৎ। বাংলাদেশের নৃত্য চর্চায় তার অবদান ভোলা যায় না। তাঁর সমকালীন সময়ে দেশের অনেক নৃত্যশিল্পীকে তাঁর নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল খুবই কম। মাত্র ৩৫ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। বুলবুল চৌধুরী শুধু একজন নৃত্যশিল্পীই ছিলেন না, একজন নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকার ও কবিও ছিলেন। তিনি একজন স্বশিক্ষিত নৃত্যশিল্পী ছিলেন।

নৃত্যকে তিনি সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনার সঙ্গী এবং তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে সহায়তাকারী শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন নৃত্যকে সবার কাছাকাছি নিতে হলে এর বিষয় নিতে হবে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে; নাচের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে অভিনয় বা অভিব্যক্তি। যেন তা যেকোনো ভাষা ও সংস্কৃতির দর্শকের কাছে তা সহজে বোধগম্য হয়ে উঠে।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ছোটো ছোটো কাহিনিভিত্তিক নৃত্য পরিকল্পনা করতে শুরু করেন; যেমন ‘অজন্তা জাগরণ’, ‘মিলন ও মাথুর’, ‘তিন ভবঘুরে’, ‘হাফিজের স্বপ্ন’, ‘সোহরাব রোস্তম’, ‘ব্রজ বিলাস’, ইত্যাদি।

রশিদ আহমেদ চৌধুরী আমাদের কাছে বুলবুল চৌধুরী নামে পরিচিত, ১৯১৯ সালের চট্টগ্রামে সাতকানিয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দুই দশকেরও বেশি কর্মজীবনে তিনি প্রায় ৭০টি নৃত্যনাট্য রচনা ও কোরিওগ্রাফ করেছেন।

ভারত বিভাগের পর, তিনি ঢাকায় স্থায়ী হন এবং তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় নৃত্যশিল্পী হিসাবে ঘোষিত হন। তিনি বাংলাদেশে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

যা করব—

- শিল্পী বুলবুল চৌধুরীর কাজ সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করব।

এই পাঠ থেকে জেনে আমি যা কৰলাম এবং শিখলাম তা লিখি-

